ইজতিহাদ কি ও কেন?

মোঃ আতিকুর রহমান

ইজতিহাদের সংজ্ঞা ইজতিহাদ আরবী □জুহদ□ শব্দ থেকে উদগত। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে কোনো কিছু হাসিল করার উদ্দেশ্যে প্রাণান্তকর চেষ্টা চালানো। ইসলামী পরিভাষায় শরী□আতের কোনো নির্দেশ সম্পর্কে সুষ্ঠু জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে সর্বাত্মক চেষ্টা ও সাধনার নাম ইজতিহাদ।

উসূলবিদদের মতে একজন ফকীহ্ শরী□আতের মূল বিষয় সমূহের ওপর কুরআন-সুন্নাহর আলোকে বিচার-বিবেচনা করে যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা তার শাখা-প্রশাখার সাথে সম্পৃক্ত হুকুম-আহকাম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার উদ্দেশ্যে যে চেষ্টা-সাধনা ও গবেষণা চালিয়ে থাকেন তাই ইজতিহাদ। এতে বুঝা গেলো, শরী□আতের যেসব বিষয় অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমানিত তা জানার জন্য চেষ্টা করার নাম ইজতিহাদ নয় এবং সেসব বিষয়ে ইজতিহাদের সুযোগ বা অবকাশও নেই। যেমন নামায ফরয হওয়া, নামায পাঁচ ওয়াক্ত হওয়া ইত্যাদি। বরং যেসব বিষয়ে কোনো সরাসরি নছ্ বা কুরআন-সুন্নাহ থেকে সমাধান পাওয়া যায় না, সেসব বিষয়ে একটি সমাধানে পৌঁছার চেষ্টা করার নামই ইজতিহাদ। ইসলামের প্রথম যুগে কিয়াস এবং ইজতিহাদ একই অর্থে ব্যবহৃত হতো। যিনি ইজতিহাদ করেন তাঁকে বলা হয় মুজতাহিদ। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি বিচার বিবেচনা ছাড়াই অপরের মত মেনে নেয় তাকে বলা হয় মুকাল্লিদ।

ইজতিহাদ কেন? ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় ইজতিহাদের গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা সমাজে এমন সমস্যারও উদ্ভব হতে পারে যার সরাসরি সমাধান কুরআন ও সুন্নাহতে নাও থাকতে পারে। কিন্তু তৎসম্পর্কিত মূলনীতি অবশ্যই রয়েছে। আর এ মূলনীতির ভিত্তিতে নব-উদ্ভূত সমস্যার সমাধানের জন্য ইজতিহাদ প্রয়োজন। এ ইজতিহাদই ইসলামী আইন ও বিধানকে সচল, সক্রিয় ও সঞ্জীবিত রাখে।

আর ইজতিহাদের পথ যদি রুদ্ধ হয়ে যায় তাহলে ইসলামী আইন ও বিধান যে সার্বজনীন ও সর্বযুগের, এ দাবীর যথার্থতা প্রমাণ করা কিছুতেই সম্ভব নয়। পবিত্র কুরআন মাজিদের বহু আয়াতে বিভিন্ন বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা ও চেষ্টা-সাধনার নির্দেশ রয়েছে যা ইজতিহাদের প্রয়োজনীয়তা ও বৈধতার ইঙ্গিত বহন করে। তাছাড়া হাদীসে বর্ণিত হযরত মু□আয ইবনে জাবাল (রা) এর নিম্নোক্ত ঘটনাটি এক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রাণিধানযোগ্য।

> মহানবী (সা) হযরত মু□আয ইবনে জাবালকে (রা) ইয়ামনের বিচারক নিয়োগ করে পাঠাবার প্রাক্কালে জিজ্ঞেস করেন, তোমার নিকট মোকদ্দমা পেশ করা হলে তুমি কিভাবে বিচার-ফায়সালা করবে? তিনি বলেন, আমি আল্লাহর কিতাব অনুসারে ফায়সালা করবো। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তা যদি আল্লাহর কিতাবে না পাও? মু□আয (রা) বললেন, আমি নবীর সুন্নাতের অনুসরণ করবো। রাসূলুল্লাহ (সা) পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, তা যদি নবীর সুন্নাতেও না পাও? মু□আয (রা) উত্তর দিলেন, তাহলে আমি আমার বুদ্ধি-বিবেচনা প্রয়োগ করে (সমাধান লাভের) যথাসাধ্য চেষ্টা (ইজতিহাদ) করবো এবং তাতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করবো না। (একথা শুনে) রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর বুকে মৃদু করাঘাত করে বললেন, সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর জন্য যিনি তাঁর রাসূলের দূতকে তাঁর রাসূলের মনোপূত যোগ্যতা দান করেছেন। (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমদ, দারেমী)

অপর একটি হাদীসে বর্ণিত আছে। যদি কেউ ইজতিহাদ করতে গিয়ে ভূলও করে, তবুও সে এর জন্য একটি নেকী লাভ করবে। পক্ষান্তরে তার ইজতিহাদ সঠিক হলে সে এর জন্য দ্বিগুণ নেকী লাভ করবে। (বুখারী, মুসলিম) উপরোক্ত হাদীস দুটি থেকে ইজতিহাদের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও বৈধতা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়।

ইজতিহাদ ইসলামী শরী□আতে যেহেতু এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তাই যে কেউ ইজতিহাদ করলেই যে তা গ্রহণযোগ্য হবে, এমন নয়। এজন্য মুজতাহিদের বিশেষ কিছু যোগ্যতা ও গুণাবলির অধিকারী হওয়া জরুরী। এ কারণে উসূলবিদগণ ইজতিহাদের প্রকারভেদ ও ইজতিহাদকারীর জন্য বেশ কিছু শর্ত বা বাধ্য-বাধকতা আরোপ করেছেন।

ইজতিহাদের প্রকারভেদ ইজতিহাদ সাধারণত তিন প্রকার। যথা: ১. ইজতিহাদ মুত্লাক বা ব্যাপক ইজতিহাদ। এটি কোনো নির্দিষ্ট মাযহাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ বা বিশেষ কোনো মাস□আলার সাথে সংযুক্ত নয়, বরং ধর্মীয় যাবতীয় আহকামের মধ্যে পরিব্যাপ্ত। এ প্রকারের ইজতিহাদ হচ্ছে সর্বোচ্চ মানের ইজতিহাদ। বিশিষ্ট সাহাবীগণ এবং প্রথম শ্রেণীর ইমামগণই এমন ইজতিহাদের অধিকারী ছিলেন।

২. ইজতিহাদ ফিল-মাযহাব বা নির্দিষ্ট কোনো মাযহাবের সাথে সম্পর্কিত ইজতিহাদ। কোনো মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা (ইমাম) কর্তৃক প্রবর্তিত ধারা ও পদ্ধতি অনুসরণে এই প্রকারের ইজতিহাদ সম্পন্ন হয়ে থাকে। ইজতিহাদের এই প্রকার প্রথম প্রকারের চেয়ে নিম্নমানের। ইমাম আবু হানিফা (রহ) এর অনুসরণে ইমাম মুহাম্মাদ ও ইমাম আবু ইউসুফ (রহ) এবং ইমাম শাফি-ঈ (রহ) -এর অনুসরণে ইমাম নববী (রহ) এই শ্রেণীর মুজতাহিদগণের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।

৩. ইজতিহাদ ফিল ফাত্ওয়া অর্থাৎ বিভিন্ন ফাত্ওয়া সম্পর্কে ইজতিহাদ। এটি দ্বিতীয় প্রকারের ইজতিহাদ থেকেও নিম্নস্তরের। এ প্রকারের ইজতিহাদে যে সকল মাস□আলা সম্পর্কে ইজতিহাদ করা হয়, মুজতাহিদের পক্ষে শুধু সেই প্রকার মাস□আলা সম্পর্কে অভিজ্ঞ হওয়াই যথেষ্ট, বিভন্ন মাযহাবের সুপ্রসিদ্ধ মুফতীগণ এই শ্রেণীর মুজতাহিদের অন্তর্ভুক্ত।

ইজতিহাদকারীর যোগ্যতা ও গুণাবলী

□ আল্লাহপ্রদত্ত শরী□আতের ওপর ইজতিহাদকারীর সুদৃঢ় ঈমান ও তা মেনে চলার একনিষ্ঠ সংকল্প থাকতে হবে। তাঁকে তাঁর বন্ধন ছিন্ন করার খায়েশমুক্ত হতে হবে এবং ইসলামী শরী□আত থেকেই পথ নির্দেশ লাভ করতে হবে।

□ প্রথম শ্রেণীর মুজতাহিদকে অবশ্যই কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস এবং তৎসংশ্লিষ্ট জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। আরবী ভাষা ও সাহিত্য এবং তার ব্যাকরণ সম্পর্কে তাঁর যথেষ্ট দখল থাকা একান্ত প্রয়োজন, কারণ কুরআন মাজীদ এই ভাষায় নাযিল হয়েছে এবং মহানবী (সা) এর সুন্নাহর ভাষাও তাই। সুতরাং কুরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কে গভীর প্রজ্ঞা ও তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যে পৌঁছুতে হলে আরবী ভাষা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক। অধিকন্তু তাঁকে কুরআন ও সুন্নাহ বর্ণিত আদেশ নিষেধ, তার শ্রেণীভেদ এবং যুক্তি প্রমাণের ধারা ও পদ্ধতি সম্পর্কে অবশ্যই পারদর্শী হতে হবে।

প্রসংগত উল্লেখ্য যে, শরী□আতের যাবতীয় আদেশ নিষেধ সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞানের অধিকারী হওয়া মুজতাহিদের পক্ষে অত্যাবশ্যক নয়। বরং যে মাস□আলা সম্পর্কে ইজতিহাদ করবেন সে সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে।

□ রাসূলুল্লাহ (সা) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলে ইসলামী আইনের ওপর যে কাজ হয়েছে এবং মুজতাহিদ ইমামগণ যুগ যুগ ধরে যেভাবে ইসলামী আইনের ক্রমবিকাশ সাধন করেছেন সেই সম্পর্কেও ইজতিহাদকারীর গভীর জ্ঞান থাকতে হবে।

□ বাস্তব জীবনের অবস্থা, পরিস্থিতি ও সমস্যা সম্পর্কে ইজতিহাদকারীর গভীর জ্ঞান থাকা আবশ্যক। কারণ এগুলোর ওপরই শরী□আতের বিধান ও মূলনীতি প্রযোজ্য হবে।

□ ইজতিহাদকারীদেরকে নৈতিকতার মানদণ্ডে উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হবে। চরিত্রহীন অবিশ্বস্ত ব্যক্তির ইজতিহাদ নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস মহিউস্ সুন্নাহ বাগাবী ইজতিহাদের যোগ্যতা সম্পর্কে বলেন : একজন মুজতাহিদকে পাঁচটি বিষয়ে আলেম বা জ্ঞান সম্পন্ন হতে হবে।

এক. কিতাবুল্লাহ অর্থাৎ কুরআন মাজিদের জ্ঞান। দুই. হাদীসে রাসূল অর্থাৎ সুন্নাহ সম্পর্কে জ্ঞান। তিন. উলামায়ে সলফ অর্থাৎ

পূর্ববর্তী আলেমগণের বিভিন্ন মতামত (ঐকমত্য ও মতবিরোধ) সম্পর্কে জ্ঞান। চার. আরবী ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে জ্ঞান। পাঁচ. কিয়াস সম্পর্কে জ্ঞান।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে উপরোক্ত পাঁচটি বিষয়ে কি পরিমাণ জ্ঞান থাকলে তাকে মুজতাহিদ বলা যাবে, এ ব্যাপারে ইমাম বাগাবী বলেন : কুরআন মাজিদের জ্ঞান বলতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে তার জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক। □ নাছেখ ও মানছূখ।১ □ মুজমাল ও মুফাস্সার।২ □ খাস ও □আম। □ মুহকাম ও মুতাশাবিহ।৩ □ মাকরূহ ও হারাম, মুবাহ, মুস্তাহাব ও ওয়াজিব।

হাদীসের ক্ষেত্রেও উপরোক্ত বিষয়সমূহ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। সাথে সাথে হাদীসটি সহীহ না জঈফ, মুসনাদ৪ না মুরছাল৫ এ সম্পর্কেও তার জ্ঞান থাকতে হবে। যদি এমন কোনো হাদীস পাওয়া যায় যা কুরআনের পরিপন্থী, এমতাবস্থায় উভয়ের মধ্যে তাতবীক বা সামঞ্জস্য বিধানের জ্ঞানও তার থাকতে হবে। কারণ হাদীস কখনো কুরআনের খিলাফ বা পরিপন্থী হতে পারে না। আর হাদীসের জ্ঞান থাকার অর্থ শুধুমাত্র সে সমস্ত হাদীস জানা থাকা জরুরী যা শরী□আতের বিভিন্ন হুকুম আহকাম বা বিধি-বিধান সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। উপদেশমূলক কিংবা কোন ঘটনা বা কাহিনীমূলক হাদীসসমূহ জানা থাকা জরুরী নয়।

এমনিভাবে আরবী ভাষার ক্ষেত্রেও সে সমস্ত শব্দগুলো সম্পর্কে জ্ঞান থাকা জরুরী যা কুরআন ও হাদীসে বিভিন্ন বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। সম্পূর্ণ আরবী ভাষায় পণ্ডিত হওয়া জরুরী নয়। তবে ভাষার ক্ষেত্রে এতটুকু জ্ঞান অবশ্যই থাকা উত্তম যা দ্বারা আরবরা স্থান-কাল-পাত্র ভেদে কোন্ ব্যক্যটি কোন্ অর্থে প্রয়োগ ও ব্যবহার করে তা বুঝা সহজ হয়। কারণ শরী□আত সম্পর্কিত যাবতীয় সম্বোধন আরবী ভাষায়ই করা হয়েছে। সুতরাং আরবী ভাষা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান না থাকলে শরী□আত প্রণেতার উদ্দেশ্য হৃদয়ংগম করা সম্ভব নয়।

অনুরূপভাবে শরী□আতের বিভিন্ন হুকুম-আহকামের ব্যাপারে সাহাবী ও তাবেঈদের বক্তব্য সম্পর্কেও একজন মুজতাহিদকে অবহিত থাকতে হবে। তাছাড়া এ উম্মাতের ফকীহগণ কর্তৃক প্রণীত অধিকাংশ ফতোয়া সম্পর্কে তাঁকে জানতে হবে, যাতে তাঁর ইজতিহাদ উলামায়ে সলফ বা পূর্ববর্তী আলেমদের বক্তব্যের পরিপন্থী না হয়।

উপরোক্ত পাঁচটি বিষয়ের একটি সম্পর্কেও যদি সে অজ্ঞ হয় তবে তবে সে মুজতাহিদ হবার যোগ্য নয়। বরং তাকে অপরের তাকলীদ করতে হবে। (ইমাম বাগাবী)

অনেক ক্ষেত্রে একই মাস□আলা সম্পর্কে বিভিন্ন মুজতাহিদ ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করে থাকেন। এরূপ ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, তাঁদের প্রত্যেকের অভিমতই সঠিক ও গ্রহণযোগ্য কি না। এর জবাবে বলা হয়ে থাকে যে, মুজতাহিদগণের অভিমত যদি পরস্পর বিরোধী না হয় তাহলে ক্ষেত্র বিশেষে তার প্রতিটিই সঠিক বলে বিবেচিত হতে পারে। পক্ষান্তরে পরস্পর বিরোধী অভিমত হলে হানাফীদের মতে ফাতওয়াগুলোর মধ্যে যে কোনো একটির অনুসরণ করা যেতে পারে। প্রসংগত উল্লেখ্য, কোনো বিষয়ে কোনো মুজতাহিদের ইজতিহাদ ভুল প্রমাণিত হলে তাঁর পক্ষে উক্ত মত পরিহার করা একান্ত কর্তব্য।

> সাধারণতঃ মনে করা হয়, বর্তমানকালে ইজতিহাদের দ্বার রুদ্ধ, কারো পক্ষে এই যুগে ইজতিহাদ করা সম্ভব নয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এটি একটি ভ্রান্ত ধারণা। কেননা বর্তমান যুগেও যদি কেউ ইজতিহাদের জন্য আবশ্যক যাবতীয় যোগ্যতা, গুণাবলী ও জ্ঞান-গরিমার অধিকারী হন, তাহলে নির্দিষ্ট সীমা ও শর্তাধীনে ইজতিহাদ করা তাঁর পক্ষে মোটেই অবৈধ বা অসম্ভব নয়। বরং আল্লাহ প্রদত্ত পূর্ণাঙ্গ দীনকে সচল ও স্থায়ী রাখার জন্য ইজতিহাদের পথ সদা উন্মুক্ত থাকবে এটাই স্বাভাবিক।

এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে, আর তাহলো, একজন মুজতাহিদের জন্য যে যোগ্যতা, গুণাবলী ও বাধ্যবাধকতা উল্লেখ করা হয়েছে তার ভিত্তি কি?

এর জবাবে বলা যায়, রাসূলুল্লাহ (সা) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে যে সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম ফাত্ওয়া বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন; অর্থাৎ শরী□আতের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার আহকাম সম্পর্কে যাদের মতামত গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতো এবং যাদেরকে বিভিন্ন এলাকার কাযী বা বিচারক হিসাবে নিযোগ করা হয়েছিলো তাঁরা সবাই মুজতাহিদ ছিলেন। যেমন : হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা), হযরত উমর (রা), হযরত উসমান (রা), হযরত আলী (রা), হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা), আবু মুসা আশ□আরী (রা), যায়েদ ইবনে সাবিত (রা), আলা ইবনে হাদরামী (রা), দাহিয়ায়ে কালবী (রা), উবাই ইবনে কা□ব (রা), আব্দুল্লাহ

ইবনে মাসউদ (রা), আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা), তাল্‌হা ইবনে উবাইদুল্লাহ (রা), যুবাইর ইবনুল আউয়াম (রা) প্রমুখ।

উপরোক্ত সাহাবাদের চরিত্র, যোগ্যতা ও গুণাবলী বিশ্লেষণ করলেই একজন মুজতাহিদের মধ্যে কি কি যোগ্যতা ও গুণাবলী থাকা আবশ্যক তা বুঝতে পারা যায় এবং একেই ইজতিহাদের যোগ্যতা ও গুণাবলীর ভিত্তি বা মাপকাঠি হিসাবে গ্রহণ করা যায়।

উদাহরণ স্বরূপ হযরত মু□আয ইবনে জাবাল (রা) এর কিছু যোগ্যতা ও গুণাবলীর উল্লেখ করা যেতে পারে, যার ইজতিহাদের প্রতি রাসূল (সা) সমর্থন জানিয়েছেন। □আনসাবুল আশরাফ□ ও □হায়াতুস সাহাবা□ গ্রন্থে বলা হয়েছে, কুরআন, হাদীস ও ফিকাহ শাস্ত্রে হযরত মু□আয ছিলেন একজন বিশেষজ্ঞ।

আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে জানা যায়, সাহাবাদের মধ্যে যে চার জনের নিকট থেকে কুরআন গ্রহণের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) নির্দেশ দিয়েছেন মু□আয (রা) তাদের অন্যতম। □তাযকিরাতুল হোফফাজ□ গ্রন্থে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা) এর জীবনকালেই হযরত মু□আয (রা) শ্রেষ্ঠ ফকিহদের মধ্যে পরিগণিত হন। খোদ রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর ফকীহ হওয়ার সাক্ষ্য দিয়েছেন। তিনি বলেছেন : হালাল ও হারামের বিধান সম্পর্কে মু□আয ইবনে জাবাল ছিলেন অন্যদের তুলনায় অধিকতর জ্ঞানী।

কা□ব ইবনে মালিক বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা) ও আবু বকর (রা) এর যুগে তিনি মদীনায় ফাত্ওয়া দিতেন। (হায়াতুস সাহাবা)

ইবনুল আসীর বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এর জীবদ্দশায় আনসারদের মধ্যে মু□আয ইবনে জাবাল (রা), উবাই ইবনে কা□ব (রা) ও যায়িদ ইবনে সাবিত (রা) ফাত্ওয়া দিতেন। (উসুদুল গাবা)

হযরত উমর (রা) একবার মু□আয সম্পর্কে বলেন : মু□আয না হলে উমর ধ্বংস হয়ে যেতো।

এ মন্তব্য দ্বারা তাঁর ইজতিহাদী যোগ্যতা ও গবেষণা শক্তি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। এ ছাড়া একবার ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, কেউ ফিকাহ শিখতে চাইলে সে যেন মু□আযের কাছে যায়। (তাযকিরাতুল হোফফায)

১। যে আয়াত বা হাদীস দ্বারা কোনো পূর্ববর্তী হুকুম স্থগিত কিংবা পরিবর্তিত হয় তাকে নাছেক আর স্থগিত অথবা পরিবর্তিত হুকুমকে বলে মানছুখ। ২। □মুজমাল□ এমন শব্দ যার অনেকগুলো অর্থ হতে পারে। গভীর অনুসন্ধান ব্যতিরেকে শুধু শব্দ দ্বারা তার নির্দিষ্ট অর্থ বুঝা যায় না। □মুফাস্সার□ এমন শব্দ যার কাঙ্খিত অর্থ এতটা স্পষ্ট যা বুঝার জন্য কোনোরূপ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজন পড়ে না। ৩। □মুহকাম□ এমন বাক্য যার কাঙ্খিত অর্থ এতটা মজবুত ও সুদৃঢ় যা রহিত বা পরিবর্তিত হবার কোনোরূপ সম্ভাবনা নেই। ৪। যে কোনো হাদীসের সনদ সম্পূর্ণ মুত্তাসিল অর্থাৎ সনদের কোনো স্তরে কোনো রাবীর নাম বাদ পড়েনি সে হাদীসকে হাদীসে □মুসনাদ□ বলে। ৫। যে হাদীসের সনদে সাহাবীর নামই বাদ পড়েছে এবং স্বয়ং তাবেঈ রাসূলুল্লাহ (সা) এর নাম করে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাকে হাদীসে □মুরসাল□ বলে।

তথ্যপঞ্জিঃ ১। ইকদুল জীদ : শাহ ওয়ালিল্লাহ দেহলভী ২। আল-মওছু □আতুল ফিক্হিয়া আল-ইসলামিয়া ৩। কাশ্ শাফ, ইসতিলাহাতুল ফনূন ৪। নূরুল আন্ওয়ার ৫। ইসলামী বিশ্বকোষ : ইসলামিক ফাউন্ডেশন

সূত্রঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক প্রকাশিত □সেমিনার স্মারক-গ্রন্থ (২০০৩-২০০৫)□

মোঃ আতিকুর রহমান